একটি যুগান্তের ছবি
সোমেশ্বর ভৌমিক

১৯৪০সালের ৭ই আগস্ট কলকাতার নিউ থিয়েটার্স স্টুডি ওতে আগুন লাগে আর অনেক নামকরা ছবির নেগেটিভ পুড়ে যায়।

নিউ থিয়েটার্সবা এন. টি. সে-যুগের বিখ্যাত চলচ্চিত্র-প্রযোজক প্রতিষ্ঠান।বাঙালী ভদ্রলোক-গোষ্ঠীর কাছে সিনেমাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার সূত্রে, এই গোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে চলচ্চিত্রকে সাফল্যের সঙ্গে একাত্ম করে তোলার সুবাদে, এই প্রতিষ্ঠানের সম্মান, সুনাম আর তাৎপর্যই ছিল আলাদা। তাছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্ণধার, সেই বীরেন্দ্রনাথ সরকারও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর প্রপিতামহ হলেন প্যারীচরণ সরকার, বাঙালী ছাত্রদের উপযোগী করে ইংরেজী ব্যাকরণের প্রথম বইটি যিনি লিখেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের পিতা স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার,বাংলা প্রদেশের প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৯সাল পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পর্ষদে আইন-বিষয় কসদস্য। ফলে এই আগুন-লাগার ঘটনাটি এক সাংস্কৃতিক দুর্বিপাকের চেহারা পেয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাটি সরাসরি যাঁকে আঘাত করেছিল, সেই বীরেন্দ্রনাথের সামলে ওঠার ক্ষমতা সবাইকে অবাক করে দেয়।

দুর্ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে, ৩০শে আগস্ট, কলকাতার চিত্রা আর পূণরন্দ্র সিনেমাহলে মুক্তি পেল নিউ থিয়েটার্সের ছবি ‘ডাক্তার’ (পরিচালক - ফণী মজুমদার)। অবশ্য ধরে নেওয়া যায় দুর্ঘটনার সময়এ-ছবির সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যদি এ-কথা মনে রাখি যে, পরবর্তী এক বছরেই নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজিত চারটি দ্বিভাষিক (বাংলা এবং হিন্দি) ছবি মুক্তি পেয়েছিল, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের জীবনীশক্তি আর এর কর্ণধারের মানসিক দৃঢ়তা সম্পর্কে আর-কোনো সন্দেহ থাকেনা। ছবি গুলোর নাম ‘অভিনেত্রী’ (পরিচালক, অমর মল্লিক), ‘নর্তকী’ (পরিচালক দেবকী কুমার বসু); ‘পরিচয়’ (পরিচালক, নীতিন বসু) আর‘প্রতিশ্রুতি’ (পরিচালক, হেমচন্দ্র চন্দ্র)।

এন.টি.-র এই হার-না-মানা মনোভাব অটুট ছিল দুর্ঘটনার পরেও অন্তত আরো বারো বছর। ১৯৫২ সালেও এই প্রতিষ্ঠান প্রযোজনা করেছিল ‘মহাপ্রস্থানের পথে’-র (পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়) মতো জনপ্রিয় ছবি (মুক্তি ৯ই মে, ১৯৫২)। অবশ্য পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছিল যে, এটা নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের দপ-করে জ্বলে ওঠার মতোই একটি ঘটনা। এ-ছবির নামটি প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আক্ষরিক তাৎপর্যই বহন করেছে।

এরকয়েকমাস আগে তখনকার বাংলা সিনেমার নয়নের মণি প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে (২৯শে নভেম্বর, ১৯৫১)। মৃত্যু শয্যায় ব্যক্ত বড়ুয়ার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এলগিন রোডে অবস্থিত সরকার বাড়ির সামনে দিয়ে। অসুস্থ, অশক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘরের জানালা থেকে সেই শোকযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শেষ যাত্রায়ও বড়ুয়া বীরেন্দ্রনাথকে জানিয়ে গেলেন তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা। কারণ? ১৯৩০-এরদশকে চলচ্চিত্র-প্রযোজনার মতো কঠিন,

এবং জটিল, দায়িত্ব থেকে বড়ুয়াকে মুক্তি দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। যখন সিনেমা তৈরির নেশায় একটি আধুনিক স্টুডিও তৈরি করতে গিয়ে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ম্সন্দুখীনহয়েছিলেন বড়ুয়া, তখন তাঁকে সাদরে এন.টি-তে বরণ করেছিলেন বি. এন.সরকার। বহুদিন এই প্রতিভাবান অথচ খেয়ালী মানুষটির সিসৃক্ষাকে সযত্নে লালন করেছিলেন। এন. টি.-র ব্যানারে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্তচোদ্দটি ছবি পরিচালনা করেছেন পি.সি. বড়ুয়া। তারপর এন.টি.-র সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায় বড়ুয়ার। কিন্তু উনি এরপরেও সক্রিয় ছিলেন এক দশকেরওবেশি সময়। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সম্পর্কছেদের বেদনা আমৃত্যু বহন করেছিলেন বড়ুয়া।

নিউ থিয়েটার্স সংক্রান্ত এইসব ঘটনাবলী বাংলা সিনেমার জগতে প্রতীকী হয়ে আছে। নানা কারণেই ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়টি বাংলা সিনেমার পক্ষে একঘটনা বহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ যুগ। প্রবন্ধের শুরু তে আমরা বাংলা সিনেমার জগতের কিছু অভ্যন্তরীণ দুর্লক্ষণের আভাস দিয়েছি। এরই সঙ্গে যোগকরা যায় বাহ্যিক দুর্যোগের একটি তালিকা; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, এবং দেশভাগ/স্বাধীনতা। এই প্রতিটি ঘটনার কালো ছায়া পড়েছে বাংলা সিনেমার জগতে। একইসঙ্গে বা পরপর এত গুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি বাংলা সিনেমার আর-কোনো যুগে। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫২সাল পর্যন্ত এই বারো বছরে খুব নিশ্চিত ভাবেই বাংলা সিনেমা এগিয়ে গিয়েছে এক যুগান্তের পথে। সেই যুগান্তের অন্যতম লক্ষণ নন্দন তাত্ত্বিক পালা বদলের একটি ধারা।

বাংলা সিনেমার নন্দনতত্ত্ব, বিশেষ করে আঙ্গিক আর বিষয়বস্তু, নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে পর্বান্তর হিসেবে চিহ্নিত হয়‘পথের পাঁচালী’ছবিটি। এর আগের বাংলা সিনেমার আঙ্গিক আর বিষয় বস্তুকে প্রাক্-আধুনিকনা হলেও অনাধুনিক হিসেবে কার্যত প্রায় নস্যাৎই করা হয়। এই নর্থক দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে রেখে বিষয়টিকে তলিয়ে দেখা যেতে পারে। সবাক যুগের শুরু থেকেই বাংলা ছবি জনপ্রিয় সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হয়েথেকেছে। নাটকীয় আধারে, যান্ত্রিক পদ্ধতির সুবিধে ব্যবহার করে কথা সাহিত্যের দৃশ্যশ্রাব্য রূপ তৈরি করাই ছিল এই প্রবণতার কেন্দ্রবিন্দু। সবাক যুগের প্রথম তিন বছরে তৈরি ছবির মধ্যে সাতটি ছিল সুপরিচিত সাহিত্যিকের রচনাকে আশ্রয় করে তৈরি; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেনা পাওনা’ (১৯৩১, পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী), আর ‘পল্লীসমাজ’ (১৯৩২, পরিচালক শিশির কুমার ভাদুড়ি), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৯৩২,পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়) আর ‘কপাল কুন্ডলা’ (১৯৩৩,পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী); দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের‘পুনর্জন্ম’ (১৯৩২, পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী);এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নটীর পূজা’ (পরিচালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)[১] আর ‘চিরকুমার সভা’ (১৯৩২, পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী)।

অবশ্য মনে রাখা ভালো, এটা বাংলা সিনেমার কোনো নতুনপ্রবণতা নয়। নির্বাক যুগের ‘বাংলা’ ছবি ও বিষয়ের খোঁজে বারবার ফিরে গেছে সাহিত্যের কাছে। ১৯৩০-এর দশক শুরু হওয়ার মুখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই কলম ধরতে হয়েছে বাংলা সিনেমায় অতিরিক্ত সাহিত্য-নির্ভরতার বিরুদ্ধে। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে লেখা একটি চিঠিতে[২] ‘সাহিত্যের চাটুবৃত্তি’ আর ‘সৃষ্টিকর্তার অভাব’ যে বাংলা সিনেমাকে একটা বদ্ধ জলায় আটকে ফেলছে, এ-বিষয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছিলেন কবি।১৯২৮ - ২৯ সালে পাশ্চাত্য -ভ্রমণের সুবাদে কবির পরিচয় হয়ে ছিলইও রোপের চলচ্চিত্রের সঙ্গে। সেখানে তখন

চলছেপরীক্ষা-নিরীক্ষার মহাযজ্ঞ। কাহিনীনির্ভর সিনেমাকেও সাহিত্যের অন্ধঅনুকরণ থেকে বাঁচানোর প্রবল প্রয়াস তখন ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে। তাছাড়াও সক্রিয় ছিল সিনেমার এক স্বতন্ত্র শৈলী, সাহিত্য-নিরপেক্ষ আধার এবং স্বতঃসিদ্ধ রূপতৈরি করার এক ব্যাপক আয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে কবি বিহ্বলহয়ে দেখেছেন, কীভাবে সচল প্রতিরূপের নন্দন তাত্ত্বিক বিন্যাসেও নিয়ে আসাযায় বিপ্লবী মতবাদের ছোঁয়া। সিনেমার এই নতুন চেহারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কবি নিজেও তৈরি করেছিলেন চলচ্চিত্রের একটি খসড়া, পরবর্তীকালে যা রূপান্তরিত হয়েছে 'শিশুতীর্থ' নামের কবিতায়।

নিখাদ, স্বনির্ভর সিনেমার জন্যে রবীন্দ্রনাথের এই আকুতির কথা খুববেশি প্রচার পেয়েছিল কিনা সন্দেহ। ১৯৩০-এর দশক জুড়েই বাংলা সিনেমার সঙ্গে জড়িত লোকজন নানা আর্জি নিয়ে দেখা করেছেন কবির সঙ্গে। তাঁদের কাউকেই কবিতাঁর এই উপলব্ধির দ্বারা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন বলে মনে তো হয় না। হয় কবি তাঁর মনের কথা ব্যক্তই করেননি, অর্থহীন প্রয়াস হবে এই ভেবে; নয়তো সেসব কথা যাঁরা শুনেছেন,তাঁরা 'সশ্রদ্ধায়' সেসব উপেক্ষা করেছেন। তবে বাংলার চলচ্চিত্র কর্মীদের পক্ষে এটুকু অন্তত বলা যায় যে, নিখাদ, স্বনির্ভর সিনেমার রূপটি তাঁদের মনে প্রোথিত করার জন্যে শুধু কবির উপলব্ধিবা অভিজ্ঞতার কথা শোনাই যথেষ্ট ছিল না। তাঁদের নিজেদেরও এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল সমসাময়িক চলচ্চিত্রেরশ্রেষ্ঠনন্দন তাত্ত্বিক উদাহরণ গুলির মুখোমুখি হওয়ার, সেবিষয়ে নিয়মিত চর্চা করার। প্রসঙ্গত বলা যায়, ইওরোপ - ভ্রমণকালে নিরীক্ষা মূলক কিছু ছবি দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্বত্ত্বেও 'নটীর পূজা'-য় সিনেমা-সংক্রান্ত কোনো নতুন দিগ্ নির্দেশ রাখতে পারেননি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। একথাও মনে রাখা ভালো, বাংলার চলচ্চিত্র কর্মীদের সামনে বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রায় একমাত্র উদাহরণ ছিল হলিউডের সিনেমা - চলচ্চিত্রের ভাষাকে ছাড়িয়ে সেখানে দৃশ্যের বৈভব এবং আড়ম্বরই ছিল প্রধান বিচার্য।

নন্দনতাত্ত্বিক, নিরীক্ষামূলক বিদেশী চলচ্চিত্র আস্বাদনের ন্যূনতম সুযোগও এদেশে ছিল না- তার নানারকম সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ আছে। অন্যদিকে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের দেশজ ঐতিহ্যের পরম্পরাতেও সিনেমার কোনো পূর্বসুরী ছিল না। ফলে বাংলার (বলা ভালো, সারা ভারতেরই) চলচ্চিত্র কর্মীদের কাজ করতে হয়েছে নানা ধরনের অসুবিধার মধ্যে। বিদেশাগত এই মাধ্যমটিকে আয়ত্ত করার কাজটি নানা প্রতিকূলতা, জটিলতা আর বিভ্রান্তিরজন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে কাহিনী বিন্যাস আর দৃশ্যগঠনে।

পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে হলিউডের সিনেমায়, কাহিনী বিন্যাসেরযে-ছকটি অনুসরণ করা হত, ভারতীয় সিনেমায় সেটিকে হুবহু অনুকরণ করাসম্ভব ছিল না। আমাদের চলচ্চিত্রকারেরা আজন্ম লালিত হয়েছেন আখ্যান বাকাহিনী বিন্যাসের (narrativity) এক দেশজ ঐতিহ্যে। এই দ্বন্দ্ব নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এদেশের সিনেমায়। আবার দৃশ্য নির্মাণেরযেসব রীতি পাশ্চাত্যের সিনেমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল,সেগুলোও ভারতীয় শিল্পকলায় ব্যবহৃত দৃশ্য সংস্থাপন রীতির থেকে অনেক আলাদা। সেখানেও ছিল টানাপোড়েন।

নির্বাক যুগে তো বটেই, সবাক যুগেও এইসব টানাপোড়েন ভারতীয় সিনেমাকে বিপর্যস্ত করেছে। চলচ্চিত্র কর্মীরা যে-যার নিজের মতো করে সেসবের মোকাবিলা করেছেন। তবে সহজতর সমাধানটি ছিল জনপ্রিয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া - কথা সাহিত্য এবং নাট্যসাহিত্য, দুয়েরই। এতে অন্তত কাহিনী বিন্যাস আর দৃশ্যগঠনের একটা পূর্বনির্ধারিত আদল পাওয়া যায়। সেই প্রাথমিক কাঠামোর ভিত্তিতে কাজ করতে সুবিধে হয় চলচ্চিত্র কারের। তবে সাহিত্য ভিত্তিক কাহিনী বিন্যাস আর দৃশ্যনির্মাণের দাবি মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিনেমার নিজস্ব গতি এবং ছন্দ ব্যাহত হয়। বলা ভালো, পঙ্গু হয়ে যায় সিনেমার নন্দন তাত্ত্বিক পরিকল্প (paradigm)। পঙ্গু হয়ে পড়া,বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া- এইসব কথা সাংস্কৃতিক বিষয়ের আলোচনায় সাধারণভাবে বেমানান। কিন্তু ভারতীয় সিনেমার আলোচনার এধরনের ভাষাব্যবহার না-করে বোধহয় উপায় নেই। ভারতীয় সিনেমার সাংস্কৃতিক কাঠামোটা খুব সুষম, ঘনবদ্ধ (homogenous, organic entity) নয়। আধুনিক এবং প্রাক্-আধুনিক, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য- এরকম নানা সাংস্কৃতি ক উপাদান এখানে পাওয়া যাবে। এগুলো শুধু সিনেমার শরীরে ক্রমান্বয়ে সন্নিবিষ্টই হয়নি, অধিকাংশক্ষেত্রেই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে, আধিপত্যের লড়াই চালিয়েছে। ফলে ভারতীয় সিনেমার কাঠামোয় একটা টানাপোড়েনের ছাপখুব স্পষ্ট ভাবেই উপস্থিত। এরই প্রধান লক্ষণ, দৃশ্য ভাষা আর সাহিত্য ভাষার দ্বন্দ্ব, আর সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টাজনিত এক সংকর আঙ্গিক।[৩]

বাংলা সিনেমার জগতে ১৯৩০-এর দশক থেকে এই লক্ষণটি বিশেষভাবে সক্রিয়। ১৯৪০-এর দশকে এসেও সেই ধারা বা লক্ষণটির উপশ মহয়নি। বরং বাংলা সিনেমার আঙিনায় বেশ কয়েকজন সাহিত্যিকের নিয়মিত উপস্থিতি এই দ্বন্দ্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো মানুষ ১৯৪০-এর দশকে ছবি পরিচালনা করেছেন। সজনী কান্ত দাস, হেমেন্দ্র কুমার রায়, হীরেন বসু, তুলসী লাহিড়ী, শচীন সেনগুপ্ত, জ্যোর্তিময় রায়, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বা নবেন্দু ঘোষের মতো নানা ধরনের, নানা মাপের সাহিত্যিক সিনেমার জন্যে কাহিনী বা চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত থেকেছেন। সাহিত্যে এঁদের প্রত্যেকেরই কমবেশি অবদান আছে। কিন্তু তাঁরা কেউই বাংলা সিনেমার জন্যে কোনো স্বভূমি নির্মাণ করেননি। তাঁদের কাছে সিনেমা ছিল সাহিত্য কর্মেরই রূপান্তর, বড়জোর সম্প্রসারণ। তবে১৯৪০ -এর দশকে অন্তত বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে, সাহিত্য-অনু প্রাণিত সংকর আঙ্গিকের মধ্যেই আধুনিকতার অন্বেষণ বা বাস্তববাদের প্রতিপক্ষ পাতিত্ব এক ধরনের আকাঙক্ষার রূপ নিয়েছে। অনুপাত বা আধিপত্যের নিরিখে বিচার করলে এর অভিঘাত হয়তো সামান্যই। কিন্তু প্রবণতাটা একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪) আর হেমেন গুপ্তর 'অভিযাত্রী' (১৯৪৬)। সমসাময়িক বিষয় বস্তুর ব্যবহার আর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে গড়পড়তা বাংলা ছবির চেয়ে অন্য ধরনের চিন্তা ভাবনার কিছু ছাপ এ-দুটি ছবিকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৪০-এর দশকেই তৈরী প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়ার দুটি ছবির কথাও বলার মতো- 'উত্তরায়ণ' (১৯৪১) আর'শেষ উত্তর'(১৯৪২)।

তবে এইসব ব্যতিক্রম থেকে মুখ ফেরালে গড়পড়তা বাংলা সিনেমারযে-চেহারাটা বেরিয়ে আসে, তা যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। ১৯৩০ আর১৯৪০-এর দশকে বাংলা সিনেমার জগতে পৃষ্ঠপোষক, পরিকল্প নাকার, সঞ্চালক আর কলা কুশলীদের মধ্যে উচ্চবিত্ত ভদ্র লোকেদেরই প্রাধান্য দেখতেপাই- সহজ

ভাষায় যাদের বলা যায় বাবু। তাদের আশা, উপলব্ধি আরআকাঙক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল জাতীয়তাবাদ। তবে বাবু সংস্কৃতিরপ্রেক্ষিতে এই মতাদর্শের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল সামান্যই। বরং একভিন্ন মোড়কে জাতীয়তাবাদের (বলা ভালো, জাতীয়তাবোধের) প্রকাশ দেখা গেছে বাংলা সিনেমায়। সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব। অবশ্য নাগরিকতা আর গ্রাম্যতার যে দ্বন্দ্বের কথা চটকরে আমাদের মনে আসবে, বাংলা সিনেমার ছকটি তার থেকে কিছুটা আলাদা। ১৯৪০-এরদশকের সিনেমায় নাগরিকতা মানে অচেনা, বহিরাগত, দৃষ্টিকটু কিছু ব্যাপার। আধুনিক জ্ঞানর্চ্চার ভাষায় একে বলা চলে 'অপর'(other)। এই নাগরিকতার উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয় উগ্র আধুনিকতা, অর্থলালসা, পাশ্চাত্য আচার-আচরণ-ভাবধারার অন্ধঅনুকরণ, দেশজ ঐতিহ্যের অবমাননা আর যৌথ পারিবারিক বন্ধন তথা দায়িত্বের প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা। দেখানো হয়, এই 'অপর'-এর আত্র মণ বা আগ্রাসন বিড়ম্বিত, বিপর্যস্তকরছে আমাদের ভূমিজ, মৌলিক পরম্পরাকে- যার আধার হল গ্রাম। মজার কথা,গ্রাম্যতার সাংস্কৃতিক লক্ষণ গুলি খুব পরিষ্কার বা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। বরং নাগরিকতার প্রকট উপাদান গুলোর সঙ্গে নানা মাত্রার বৈপরীত্য তৈরি করে এর একটা আবছা আদল দেওয়া হয়। সরাসরি সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব পরিহার করার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল গ্রাম্য আচরণের ব্যাপ্তি, গভীরতা, নমনীয়তা আর সহনশীলতাকে তুলে ধরা। যেন, গ্রাম্যতা নিজের কর্তৃত্ব জাহির করে না; বরং 'অপর' বা নাগরিকতার উল্লাসিক তেজকে প্রশমিত করার প্রতিজ্ঞায় সে স্থিত। ১৯৪০-এর দশকে গড়পড়তা বাংলা ছবিতে তাই গ্রামছাড়া মানুষ শহরে আসে -- শিক্ষা, অনুপ্রেরণা আর পরিশীলনের খোঁজে। নাগরিকতার প্রাথমিক অভিঘাত তাকে বিহ্বল, আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু শহর তাকে গ্রাস করতে পারে না। সে-ইবরং তার গ্রামীণ সংবেদন আর আভিজাত্যের স্নিগ্ধবারি সিঞ্চন করে শহরের মাটিতে। শান্ত করে, মুগ্ধ করে, জয় করে নেয়না গরিককে।

অবশ্য গড়পড়তা এই ছকের এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম তৈরি করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। বড়ুয়ার প্রোটাগনিস্ট বিবাগী, আত্ম পীড়নকামী এক প্রেমিক চরিত্র। তার শিকড় গ্রামে। শহরের পথে তার অভিযাত্রার মধ্যে কোনো উজ্জীবনেরও স্বপ্ন থাকেনা। দেবদাস এবং তারআদলে তৈরি বাংলা সিনেমার বহু চরিত্র শহরে গেছে দুঃখ -শোকে নিজেদের নষ্টকরবে বেলে। শহর এসব ছবিকে তাদের একাকীত্ব, বঞ্চনা আর অপূর্ণ প্রেম বা আকাঙক্ষার আধার। এ-ও নাগরিকতার আর-এক ধরনের সমালোচনা- যা জাতীয়তাবাদের কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্ষয়িষ্ণু, হৃতগৌরব বাবু সংস্কৃতির এই দুঃখ বিলাসই ১৯৪০-এর দশকে বাংলা ছবির প্রধান আধেয় হয়ে ছিল। একদল সমালোচকের মতে, বহিরাগত আর দেশীয় ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বের এই রূপায়ণও এক ধরনের রাজনৈতিক তাৎপর্যে মন্ডিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বাংলার সমাজ জীবনে যে বড়সড় একটা পরিবর্তন ঘটে গেল, তার প্রধান চালিকাশক্তি ছিল দ্রুত উত্থানশীল একমধ্য বিত্তশ্রেণী। চাকরি, পেশা বা ব্যবসা (সত্যি বলতে, দালালি) এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবলম্বন। ফলে তাদের আচার-ব্যবহার, ভাষা-ভঙ্গী সবই বাবু সংস্কৃতির থেকে আলাদা। সমাজ জীবনে আধিপত্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে প্রবল। কিন্তুসেখানেও উপস্থিত হয় সমস্যা। স্বাধীনতার লগ্নে বাবু-সংস্কৃতি প্রাধান্য হারালেও তার আভিজাত্যবোধ তখনো অটুট। আর উঠ্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দাপট সত্ত্বেও মর্যাদার প্রশ্নে তারা তখনোব্রাত্য, অন্তত নিম্নবর্গীয়।

অবশ্য সদ্য-আবিষ্কৃত অর্থনৈতিক শক্তি র দাপটেতাদের আকাঙ্ক্ষাও তখন প্রবল, বৈচিত্র্যময়, ঊর্ধ্বমুখী। ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সেই আকাঙ্ক্ষাকে আরো জোরদার করে তোলে। সমাজ জীবনের নানাক্ষেত্রে তার প্রতিফলন হতে থাকে - সবচেয়ে বেশী প্রতিফলন বোধহয় ঘটে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। সাহিত্য, সংগীত আর নাট্যে তখন মধ্যবিত্তের প্রবলপ্রতাপ। বাংলা সিনেমাও মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিরএই জোয়ারে সামিল হয়ে পড়ে। ব্যক্তি মানুষের সাংস্কৃতিক নির্মাণের যে-আদলটায় বাংলা সিনেমার দর্শক অভ্যস্ত হয়েছিল ১৯৩০-১৯৪০-এর দশকে,তারও দ্রুত রূপান্তর ঘটে গেল।

স্বাধীনতার পরে জাতীয়তাবাদের এক নতুন পরিকল্প তৈরিহল আত্মনির্ভর জাতি বা স্বনির্ভর রাষ্ট্র গঠনের ঘোষিত লক্ষ্য সামনে রেখে। এই নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর যুক্তি বাদ তাদের শিক্ষা আর মননের ভিত্তি। আধুনিক সংস্থা বাসংগঠন এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তারা অনুরক্ত। তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সম্পর্কেও ভীষণ সচেতন, হয়তো স্পর্শকাতরও। তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অত্যুৎসাহী। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই তৈরি হতে থাকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সিনেমার সাংস্কৃতিক পরিকল্প--- মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক উত্থানের পাঁচালী। অবশ্য এই উত্থানের পথটি খুব মসৃণ নয়। সেখানে একদিকে আছে আধুনিক মূল্যবোধ আর সংস্থার প্রতি আনুগত্যের দায়, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পিছটান। পূর্বতন বাবু সংস্কৃতিতে যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের রূপায়ণ ছিল ১৯৪০-এর দশকে বাংলা সিনেমার প্রাণরস,স্বাধীনতার লগ্নে তারই রূপান্তর ঘটলো মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ-সঞ্জাত অন্যএক সাংস্কতিক জাতীয়তাবাদের কাঠামোয়। এর প্রতিফলন দেখা গেছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সিনেমাতেও।

আপাত দৃষ্টিতে অবশ্য বাংলা সিনেমার চেহারায় বিরাট কোনো পরিবর্তন এল না। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও বাংলা সিনেমার প্রধান বিষয় গ্রাম- শহরের বৈপরীত্য আর দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই বাহ্যিক সাদৃশ্যের মধ্যেও ধীরে ধীরে বদলে দেওয়া হয়েছে এই দ্বন্দ্বের নিহিতার্থ আর পরিণতি। স্বাধীনতার পরে যেসব ছবি তৈরি হচ্ছিল, সেখানেও গ্রামের মানুষ শহরে আসে - কিন্তু এখনকার এই আসা ধবংস হতে নয়, উজ্জীবিত হতে। কারণ সমসাময়িক সামাজিক মতাদর্শে তখন উন্নয়ন, প্রগতি, সমৃদ্ধি, বাঞ্ছিত বা শ্রেয়, এইসব কিছুর সঙ্গেই সমার্থক হয়ে গেছে নাগরিকতা। নাগরিকতার এই নতুন মূল্যায়ন আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল বাংলা সিনেমায়।

১৯৪৬-৪৭ সালের পর বাংলা ছবির বিষয় নির্বাচনে, বিন্যাসে, অভিনয়ে এবং প্রযুক্তিগত কাজকর্মে কিছু নতুনত্ব দেখাগেছে। ১৯৪৬ সালথেকেই রূপান্তরিত রাজনৈতিক পরিবেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনীবেশ গুরুত্ব পেতে থাকে। তৈরিহতে থাকে দেশাত্মবোধক ছবি। ১৯৪৬ সালে সুধীর বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'বন্দে মাতরম', ১৯৪৭ সালে সতীশ দাশগুপ্ত ও দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'পথের দাবী' বেশসাড়া ফেলেছিল। ১৯৪৮ সালে মনোজ বসুর কাহিনী নিয়ে হেমেন গুপ্ত তৈরি করলেন'ভুলি নাই'। এ-ছবির বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, '' স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়ে ঘুমন্ত দেশকে যারা জাগিয়ে তুলেছিল, তাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি''। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট একটি অধ্যায়নিয়ে ১৯৪৯ সালে তৈরি হল নির্মল চৌধুরী পরিচালিত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

লুণ্ঠন'। ১৯৫১ সালে মুক্তি পেল হিরন্ময় সেন পরিচালিত ছবি 'বিপ্লবী ক্ষুদিরাম'। তবে হেমেন গুপ্ত পরিচালিত ছবি '৪২' স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি হলেও সেন্সর পর্ষদের অবাঞ্ছিত নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নির্ধারিত সময়ের প্রায়পাঁচ বছর পরে ১৯৫১ সালে এ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রের সমাজ ও ব্যক্তি নির্মাণের মডেল হয়ে এল মনীষীদের জীবনীচিত্র ঃ ১৯৪৬ সালে প্রতিভা শাসমল পরিচালিত 'নিবেদিতা', ১৯৪৯ সালে অমর মল্লিক পরিচালিত 'স্বামীজী', ১৯৯৫ সালে মধু বসু পরিচালিত 'মাইকেল মধুসূদন আরকালী প্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'বিদ্যাসাগর'। সে সময়ের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে নাম করা যায় ঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবন নিয়ে তৈরি জ্যোতির্ময় রায় পরিচালিত 'দিনের পরে দিন'(১৯৪৯) এবং 'শঙ্খবাণী' (১৯৫০), দেবকীকুমার বসু পরিচালিত গীতপ্রধান দুটি ছবি 'কবি' (১৯৪৯) আর'রত্নদ্বীপ' (১৯৫১) নতুন ধরণের রহস্যচিত্র নবাগত পরিচালক অজয় করের 'জিঘাংসা' (১৯৫১)। নবাগত পরিচালক সত্যেন বসু পরিচালিত হাসির ছবি 'বরযাত্রী' (১৯৫২)। অমল কুমারবসু পরিচালিত আরেকটি হাসির ছবি 'উত্থেড্রারথ' (১৯৫০) এবং যৌন রোগকে কেন্দ্রে রেখে একটি পারিবারিক কাহিনী চিত্রকালী প্রসাদ ঘোষ পরিচালিত ''কার পাপে''(১৯৫২)।

কিন্তু অন্য এক ধরণের পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত তখন বাংলা সিনেমায়। গণনাট্যের সংঘের যে অভিঘাত সেসময় বাংলা সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে নাটকে আরগানে প্রবল ভাবে অনুভূত হচ্ছিল তার প্রভাব এসে পড়ল বাংলা ছবিতে।গণনাট্যের অনুপ্রেরণায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আর জীবনের সংগ্রামকে উপজীব্য করে বেশ কয়েকটি ছবি তৈরী হল। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর'দুঃখীর ইমান' নাটক অবলম্বনে সুশীল মজুমদার পরিচালিত সর্বহারা (১৯৪৮), সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত গল্প 'ফসিল' অবলম্বনে বিমলরায়ের 'অঞ্জন গড়' (১৯৪৮)। কিশোরদের সমস্যা নিয়ে অগ্রদূত পরিচালিত 'বাবলা' (১৯৪৮)। কিশোর অপরাধীদের নিয়েসত্যেন বসু পরিচালিত 'পরিবর্তন' (১৯৫০)। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের কাহিনী অবলম্বনে মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'তথাপি' (১৯৫০)। তবে এই ধারার প্রধান দুটি সৃষ্টি নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' (১৯৫১)। আর ঋত্বিক ঘোটক পরিচালিত 'নাগরিক' (১৯৫২ সালে তৈরী মুক্তির সাল ১৯৭৬)। বাস্তববাদের যে মডেলটা তখন শিল্প-সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে, তারই ছায়াপাত এই দুটি ছবিতে।

এটা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। কেননা, তখনকার গড়পড়তা বাজন প্রিয় বাংলা ছবিতে আমরা যে সব সাংস্কৃতিক উপাদনের দেখা পাইসেগুলির অধিকাংশই চরিত্রে প্রাক্-আধুনিক, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাক্-পুঁজিবাদী পরিকাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেসবের পাশাপাশি অন্যতম উপাদান হিসাবে মাঝে মধ্যে বাস্তববাদেরও জায়গা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ছবির নান্দনিক কাঠামোয় বাস্তববাদ একটি সামগ্রিক উপাদান হিসাবে আকাঙ্খার বস্তু হয়ে উঠেছে। ১৯৪৭ - ১৯৪৮ সাল থেকে। সেই আকাংখাই মূর্ত হয়ে উঠল নিমাই ঘোষ আর ঋত্বিক ঘটকের দুটো ছবিতে। বাংলা সিনেমা জগতে বাস্তববাদের আধিপত্য কায়েম করার প্রক্রিয়ায় এই দুটো ছবির বিশেষ অবদান আছে। অবশ্য বাস্তববাদের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য আর আনুগত্যের তাৎপর্যময় প্রয়াস দেখার জন্যে বাংলা ছবির দর্শককে অপেক্ষা

করতে হয়েছে আরো প্রায় তিন বছর।[৫] ১৯৫৫ সালে ২৬শে আগস্ট মুক্তি পাওয়া সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' বাংলা সিনেমায় বাস্তববাদের বিজয়কেতন ওড়ালো। 'পথের পাঁচালী'র বাস্তববাদ কখনোই হঠাৎ -আলোর ঝলকানি বা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ গোছের কোনো ব্যাপার নয়। বরং এ এক সচেতন ইতিহাস সম্মত নির্বাচন। তবেসেই নির্বাচনেরও আছে এক বিস্তৃত পটভূমি। সেখানে যেমন গুরুত্ব পাবে সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত প্রস্তুতির অধ্যায় অথবা সহমর্মীদের নিয়ে সমবেত অনুশীলনের আখ্যান,[৬] তেমনি বাংলা সিনেমার বিষয় ও আঙ্গিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রতিদ্বন্দ্বি তার কথাও উপেক্ষা করার মতোনয়।

অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮-৪৯ সালে পরপর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাংলা সিনেমার পরিবেশ টাকেই বদলে দিল। আর ১৯৫০-৫১-৫২ সাল বাংলা সিনেমাকে দাঁড় করিয়ে দিল এক সন্ধিক্ষণের মুখে।

১৯৪৯ সালে ফরাসী পরিচালক জঁ রেনোয়া গ্রামবাংলার পটভূমিকায় হলিউডের ছবি 'দ্য রিভার' পরিচালনার সূত্রে কলকাতায় আসেন। সেসময় ভারতীয় সিনেমার নান্দনিক গঠন এবং তার সাংগঠনিক উপাদান বিষয়ে বেশ কিছু কথা বলেছিলেন উনি - শ্রোতা, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে জড়িত চলচ্চিত্র-অনুরাগী একদল তরুণ। ভারতীয় সিনেমায় নান্দনিক গঠনের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে খুবই তাৎপর্যময় মন্তব্য করেছিলেন রেনোয়া ঃ

'তোমাদের দেশী চলচ্চিত্র কখনো খুব বাস্তব, কখনো অত্যন্ত রীতিবদ্ধ। হয় সবটাই বাস্তব করতে হবে-ইউরোপের মতো--নয় সবটাই সরল ঢঙে বাঁধতে হবে, এদেশের ঐতিহ্যের রীতিতে। দুইয়ের সংমিশ্রণ বড় চোখে লাগে'। রেনোয়া চেয়েছিলেন, ভারতীয় শিল্পরীতির নিজস্ব ঐতিহ্যকেভারতীয় সিনেমাতেও অন্বিত করে নিন এদেশের চলচ্চিত্রকারেরা ঃ 'তোমাদের দেশের আঁকা ছবিতে - রাজপুত ছবি থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত--- সবটাই কাল্পনিক রূপ, বাস্তবকে তাতে অনেক বাঁকিয়ে চুরিয়ে শিল্পের রূপ দেওয়া হয়েছে। চোখে যা দেখি তার হুবহু নকল নেই। কেবল তার অন্তর্নিহিত সুরটা আছে। তবু এদেশের লোক বহুশতাব্দী ধরে তাকেই মেনে নিয়েছে। এটা কত বড় গুণ তা বলা যায় না। মনেহয় তোমাদের সিনেমাতেও বোধ হয় আঁকা ছবির ঐ কাল্পনিক রূপটা এলেই ভালো হবে। তোমাদের অন্যান্য শিল্পের যেটা চরিত্র সেটাই সিনেমায় আসা দরকার।'[৭]

রেনোয়ার এই সব উপদেশের পরেও অবশ্য বাংলা, তথা ভারতীয়, সিনেমায় বাস্তববাদের প্রবল অভ্যুত্থানকে ঠেকানো যায়নি। সেই অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। অভ্যুত্থানের যাঁরা নায়ক, তাঁরাও অনেকদিন আগেই এবিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। ১৯৫০সালে প্রকাশিত একটি লেখায় সত্যজিৎ রায়ের টুকরো দুটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যময়- 'বাস্তবপন্থী ফিল্ম সময়ের অগ্নিপরীক্ষা যেমন পার হতে পেরেছে, আর কোনো ফিল্ম তাপারেনি। বাস্তবমুখিন তাই আধুনিক চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য।[৮]

এক্ষেত্রে অণুঘটকের ভুমিকা নিয়েছিল ১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসবের ডালি সাজানো হয়েছিল মূলত পাশ্চাত্যের (বিশেষ ভাবে ইউরোপের)

বাস্তববাদী সিনেমাদিয়ে। ফলে স্লোগানের মতোই আওয়াজ উঠল, বাস্তববাদই হতে পারে আধুনিক সিনেমার প্রধান উপাদান। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় সেই স্লোগানের সার্থক পরিণতি। অবশ্য একাজে তিনি একা নন, ছিলেন তাঁর সমসাময়িক এবং অনুগামী বেশ কয়েকজন। এমনকি বিমল রায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত পরিচালকও ১৯৫৩ সালে লিখলেন 'আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আমাদের চলচ্চিত্র বাস্তববাদের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে- বাস্তবতার অনুকুল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে'।[৯]

বাস্তববাদের জন্য এই আকাঙ্খা অবশ্য গড়পড়তা বাংলা ছবিতে খুব বেশিপ্রভাব ফেলেনি। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে ভারতীয় সিনেমার নতুন যে-পরিকল্পটিরূপ পাচ্ছিল, তার স্পষ্ট প্রভাব ছিল বাংলা সিনেমার জগতেও। প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি হিসেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, আধুনিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব পুরাতনকে বর্জন করার মানসিকতা, সামাজিক বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান, সামাজিক ন্যায়-প্রতিষ্ঠার আদর্শের প্রতিতাদের আনুগত্য - এইসব উপাদানের রূপায়ণ বা উপস্থাপনা বাংলা সিনেমার আদলে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করল। দেশ, সমাজ, পরিবার, দাম্পত্য -এরকম বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন যুগের নুতন মানুষদের সমস্যা বিচারের বেশকিছু ছক তৈরী হল এই সময়ের সিনেমায়। অবশ্য এইসব ছকের মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ালো মেলোড্রামা। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই নতুন ধারার ইঙ্গিত টুকুই ছিল। তখনো প্রমথেশ বড়ুয়া আর নিউ থিয়েটার্সের প্রভাব বাংলা সিনেমায় প্রবল। অন্যদিকে, সম্ভাব্য নতুন ধারার উপাদন গুলিও ঠিকমতো চিহ্নি ত বা স্পষ্ট নয়; বিশেষ করে নতুন ধারার গড়পড়তা ছবির বিষয়, কাঠামো আর মেজাজের সঙ্গে মানানসই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর আদল। তখন যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী দাপটে অভিনয় করছেন তাঁদের অধিকাংশই কি চেহারায়, কি অভিনয় ক্ষমতায় প্রাক-স্বাধীনতা যুগের জাতীয়তাবাদী পরিকল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে লিপ্ত। নতুন পরিকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্যে দরকার ছিল নতুন মুখ। সেই রকম নতুন মুখের সন্ধান চলছিল ১৯৪৯-৫০ সাল থেকেই। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া নির্মল দে পরিচালিত ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর' এ সেই অনুসন্ধান যেন এক পরিণতিতে পৌঁছাল। উত্তম কুমার আর সুচিত্রা সেন হয়ে দাঁড়ালেন নতুন যুগের প্রতীক।

অবশ্য তাঁদের জয়যাত্রার সত্যিকার সূচনা ১৯৫৪ সালে, অগ্রদূত পরিচালিত 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে।[১০] 'অগ্নিপরীক্ষা'-র মুক্তি ৩রা সেপ্টেম্বর। একমাস পরেই, ঠিক করে বললে ১লা অক্টোবর, মুক্তি পেল নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানের শেষ ছবি 'বকুল'। বড়ুয়া-এন.টি. যুগের তিরোধানে শুরু হল সুচিত্রা-উত্তমের যুগ।[১০]

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. এটিকেঅবশ্য পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র বলা যাবে না, বলা ভালো, নৃত্যনাট্যের চলচ্চিত্রায়িত দলিল।

২. এ-চিঠি লেখা হয়েছিল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ছোট ভাই মুরারী ভাদুড়ীকে। তারিখ, ২৬শে নভেম্বর,১৯১৯।

৩। এই সময়ে বাংলা সিনেমার জগতে প্রতি বছরই জনপ্রিয় সাহিত্য অবলম্বনে, একাধিক ছবি তৈরি হয়েছে। চলচ্চিত্রের ভাষারক্ষেত্রে সেইসব ছবির অবদান, কতখানি, তা নিয়ে সমালোচকদের বিশেষ মাথাব্যথা ছিলনা। কিন্তু চলচ্চিত্রের পর্দায় 'যথার্থ' সাহিত্যরসটি ফুটে

উঠেছে কিনা, সেদিকে শ্যেনদৃষ্টি ছিল সবার, বিশেষ করে সমালোচকদের। আক্ষরিক অর্থেই এ-এক সোনার পাথর বাটির অনুসন্ধান।

৪. ১৯৫২ সালে তৈরি আর ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া একটি ছবি সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বাঁশের কেল্লা'-র কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৫. ইতিমধ্যে মুক্তি -পাওয়া এই ধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ 'নতুন ইহুদী' (১৯৫৩, পরিচালক সলিল সেন)'কেরানীর জীবন' (১৯৫৩, পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায়),'ভোর হয়ে এল' (১৯৫৩, পরিচালক সত্যেন বসু), 'পথিক'(১৯৫৩, তুলসী লাহিড়ীর নাটক অবলম্বনে তৈরি ছবি - পরিচালক দেবকী কুমার বসু), 'রিক্সাওয়ালা'(১৯৫৫, পরিচালক সত্যেন বসু)।

৬. এ-বিষয়ে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাবে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় - এ প্রবন্ধে 'সত্যজিৎ রায় ঃ ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক'' (অনুষ্টুপ, বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৩)।

৭. দুটি উদ্ধৃতিরই সূত্র চিদানন্দ দাশগুপ্ত-র প্রবন্ধ 'রেনোয়ার চোখে বাংলাদেশ'' চলচ্চিত্র (প্রথম পর্যায়) সংকলনর, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; পৃঃ ৫৩।

৮. দ্রঃ সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ ''বাস্তবের পথে চলচ্চিত্র '' চলচ্চিত্র (প্রথম পর্যায়); পৃ ঃ ১৩,

৯. দ্রঃ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও সম্পাদিত , 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপরেখা'; কলকাতা বাণীশিল্প, ১৯৯৭; পৃঃ৭৯।

১০. উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেনকেও অবশ্য 'আধুনিক' নায়ক -নায়িকার ভাবমূর্তি অর্জন করতে হয়েছে,পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। বিশেষ করে উত্তম কুমার ১৯৪৮ সালের 'দৃষ্টিদান' (পরিচালক,নীতিন বসু) তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি। কিন্তু ১৯৫৪ সালে 'অগ্নিপরীক্ষা' মুক্তি পাওয়ার আগে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা আর যোগ্যতা নিয়ে বারবার কথা উঠেছে। তুলনায় সুচিত্রা সেনের উত্থান অনেক মসৃণ। ১৯৫২ সালে সুকুমার দাসগুপ্ত পরিচালিত 'সাত নম্বরকয়েদী' সুচিত্রার প্রথম মুক্তি পাওয়া ছবি। প্রথম ছবিতেই তিনি মোটামুটি সফল। কিন্তু 'আধুনিক' নায়িকা হিসেবে তাঁর পরিণতির প্রথম স্বাক্ষর অবশ্যই'অগ্নি পরীক্ষা'।

সোমেশ্বর ভৌমিক -এর জন্ম কলকাতায় ১৯৫৬-তে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এখান কারই স্থায়ী বাসিন্দা এখন। অর্থনীতির ছাত্র হয়েও দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যমের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে পড়াশোনা আর লেখালেখি করেছেন। সেই সূত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন (১৯৯০-৯২) 'স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে সেন্সর ব্যবস্থা'বিষয়ে।এখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এডুকেশনাল মিডিয়া রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসাবে। শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র ও টেলিভিশন পোগ্রামও করেন। দেশি নৌকা তৈরির পদ্ধতি নিয়ে সোমেশ্বরের তথ্যচিত্রটি ১৯৯৭ সালের সেরা শিক্ষামূলক তথ্যচিত্রের পুরস্কার পায়। তাঁর লেখা বই - সিনোমার ভালোমন্দ,সেন্সর ও সিনেমা, ভারতীয় চলচ্চিত্র ঃ একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদন, বোকা বাক্স - রূপোলিপর্দা, Indian Cinema: Colonial Contours ।

৪০-এর দশক বাঙালীর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য দশক। একদিকে স্বাধীনতা লাভের অনাবিল আনন্দ অন্যদিকে দেশভাগ আর দাঙ্গার দগদগে ক্ষত। বাঙালীর মননে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতের জগতেও ও কি

ভাঙা-গড়ার খেলা চলেনি। ৪০ -এরদশকের চলচ্চিত্রের ঘটনাবলীর এক সংক্ষিপ্ত খতিয়ান এই লেখাটি (অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত)।